শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(নবম কিস্তি)

ক্লাস করছিল ফাহিম।
যদিও ক্লাসে মন সেই ওর। ড্রয়িং ক্লাস। ড্রয়িং সার ব্লাকবোর্ডে একটি ছবি এঁকেছেন। দুই চালা একটি ঘর। পিছনে বাঁশ ঝাড়। তারও পিছনে একটা নদী। নদীতে একটি নৌকা। ধু ধু ওপার দেখা যাচ্ছে। সাধারণ উপাদান । তবুও অসাধারণ লাগছে ছবিটি। সবকিছু খুব জীবন্ত।
ফাহিম ছবি আঁকা শেষ করে খাতাটা সারের টেবিলে রেখে আসল। সার চোখ বন্ধ করে হাতে ধরা তসবিহ টিপছেন। আজাদ ড্রয়িং সারকে ঠিক বুঝতে পারে না। শুনেছে সার নাকি ফকির বাড়ি মসজিদের ইমাম। মসজিদটি বেশ বড়। সেই মসজিদের ইমাম হয়ে তিনি কিনা ড্রয়িং শেখান।
ফাহিম শুনেছে ধর্মের সাথে নাকি আঁকা-আঁকির বিরোধ আছে। সারকে দেখে তা কিন্তু কখনো মনে হয় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে, শব্দটি আসলে একটি বিমানের হবে। শব্দটা হঠাৎ নাই হয়ে গেল। আবার ফিরে এলো। কানের তালু ফেটে যাবার উপক্রম।

ড্রয়িং সার ছুটাছুটি শুরু করলেন। কেউ যেন ক্লাসের বাইরে না যায়। আস্তে আস্তে সবার মধ্যে একটা ভয় প্রবাহিত হতে থাকল। কারণ প্লেনের শব্দ তো ফিরে ফিরে আসার কথা না।

ফাহিমের মনে পড়ল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার কথা। তাহলে ভারত কি এ্যাটাক করলো ? হবে হয়তো। হঠাৎ বিকট শব্দে দুনিয়া কেঁপে উঠলো। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল স্কুলের বিল্ডিংটা। মনে হচ্ছে খুব কাছেই বোম্বিং হয়েছে। ফাহিম জানে না বোম্বিং এর শব্দ কেমন হয়। ওর অনুমান বলছে এটা বোম্বিংই হবে। কিছুদিন আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ছবি দেখেছে, ক্রেনস আর ফ্লায়িং । এ রকম শব্দই শুনেছে ফাহিম ওই ছবিতে ।

এখন আর প্লেনের শব্দটা নেই। হয়তো দূরে চলে গেছে। কে জানে আবারও হয়তো ফিরে আসবে। টিচাররা অনেক কষ্টে ছেলেদেরকে ধরে রাখছে ক্লাসের মধ্যে। যদি স্কুলের এদিকটায় বোম্বিং হয় ? হতে তো পারে। কারণ স্কুলের এক অংশে মিলিটারিরা থাকে।

হঠাৎ হেড সারকে দেখা গেল করিডোরে। উনি ঝড়ের গতিতে ঢুকলেন ক্লাসে। বললেন, তোমরা এখন বাসায় চলে যাও, তোমাদের ছুটি দেয়া হল। তোমাদের ক্লাস আবার কবে শুরু হবে তা আমরা পরে তোমাদের জানাবো । দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে আমাদের নিরাপদে থাকতে হবে। তোমরা এখন যে যার বাসায় চলে যাও।

হেড সার ঝড়ের মত আবার বেরিয়ে গেলেন। ঢুকলেন পরের ক্লাসে।

দশ মিনিটের মধ্যে সব ছাত্র স্কুলের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সবার মুখে ভয়ের পরিবর্তে হাসি। স্কুল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো বার্ষিক পরীক্ষাও আর হবে না। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে একজন ছাত্রের কাছে।

দুরে দাঁড়ানো পাকিস্তানী মিলিটারিদের মুখে কিন্তু হাসি নেই । তার মানে কী ? এই এয়ার রেইডটা কি ইন্ডিয়ার ? আর ইন্ডিয়া তো এখন বাঙালির মিত্র। এক কোটি বাঙালীকে তারা আশ্রয় দিয়েছে। সাহায্য করছে মুক্তিযুদ্ধে। ভাবতে ভাবতে ফাহিম বাসায় ফিরছিল। আনন্দে ভরপুর তার মন।

পথে অনেক কথা শুনছে ফাহিম। যে বিমান হামলাটা হয়েছে আধা ঘণ্টা আগে, এটি বরিশাল ডকইয়ার্ডে হয়েছে। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স করেছে। দুই-এক দিনের মধ্যে মুক্তিবাহিনীরা বরিশালে ঢুকে যাবে। পাকিস্তানী মিলিটারিরা নাকি পালাচ্ছে। কোনটা রেখে কোনটা বিশ্বাস করবে, বুঝতে পারছিল না ফাহিম। ওদের স্কুলে তো এখনো মিলিটারি আছে। তাহলে?

সন্ধ্যার আগে আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফাহিম। বড় ভাই ফিরোজ ফাহিমের সব ব্যাপার জানে। তাই ফাহিম মাকে জানাল, মিল্টনের কাল অংক পরীক্ষা। ওকে অংক দেখাতে হবে। তাই ওদের বাসায় যাচ্ছি। রাত ন'টা-দশটার দিকে ফিরবো। সন্দেহ করলেন না মা ফাতেমা বেগম।

ওই একই গল্প করল মিল্টন তার মামির কাছে। অর্থাৎ ফাহিমের কাল অংক পরীক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা বাধল বাদলের ক্ষেত্রে। ও কোন বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত দেখাতে পারল না। হাবিব সাহেব কোন ছেলেকে ঘর থেকে বের হতে দিলেন না।

লক্ষণ কাকার বাসার পশ্চিমের বাগানের অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে ফাহিম ও মিল্টন। ফাহিমের হাতে একটা মশাল ও মিল্টনের হাতেও একটা মশাল। স্বপন ও তার অন্য দুই বন্ধু ত্রিশ গজ দুরে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

অন্য দিন এই সময়ে রাজাকাররা ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেয়। আজ এখনো কোন আলো জ্বলছে না। কেন ? ভাবছে ফাহিম। হতে পারে ওরা কোন কাজে একত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সবাই কেন যাবে ? কেউ না কেউ তো ঘরে পাহারা দেয়ার কথা।

এমন সময় ফাহিম দেখল, স্বপনরা জঙ্গল থেকে বের হয়ে খাল পেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগুচ্ছে। তিনজনই আলাদা করে এগুচ্ছে। এক সময় পৌঁছে গেল ক্যাম্পের পিছনে। এই সময় মিল্টন মাটিতে পোতা মশালটি জ্বালিয়ে দিল। এবং চলে এলো বিশ গজ দুরে ফাহিমের কাছে। এবার ফাহিম ওর মশালটি জ্বালাল। এবং দুজনই দৌড়ে সরে গিয়ে ত্রিশ গজ দুরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

সমস্ত বাগানটা আলোকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু কোন রাজাকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো না। কিংবা উঁকিও দিল না। তবে কি কেউ নেই ঘরে ? না থাকলে তো ভালই।

স্বপন ঘুরে ঘরের পূব দিকে চলে এলো। যদি কোন গার্ড থাকে, সে নিশ্চয়ই এখন চলে যাবে ঘরের পশ্চিম পাশে। দেখবে আলোর উৎসটা কী। পূর্ব দিক থেকে স্বপন যেতে থাকল সামনের দরজার দিকে। ঘরে কেউ থাকলে এই দরজা দিয়ে বের হবার কথা। স্বপনের হাতে স্বয়ংক্রিয় একটা অস্ত্র। অস্ত্রসহ হাত দুটো সামনে বাড়ানো। আঙ্গুল ট্রিগারে। না কেউ বেরুচ্ছে না। যদিও দরজাটা খোলা। তবুও অপেক্ষা করা ভাল। অপেক্ষা করছে ও। এক পর্যায়ে স্বপন হাত ইশারায় কাছে ডাকল অন্য দুজনকে।

একজনকে দরজার মুখে রেখে স্বপন ও অন্যজন ঢুকল ভিতরে। না কোথাও কোন শব্দ নেই। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওরা এগুলো ভিতরে। বাগান থেকে মশালের আলো আলোকিত করছে ভিতরটা। চোখে কিছুই পরছে না ওদের। নিচতলার একটা রুমে তালা মারা।

বাগানের আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এলো মিল্টন ও ফাহিম। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাসার পিছনে। না, কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছে না ফাহিম। আরও এগিয়ে পৌঁছে গেল দরজার কাছে। ভিতরে ঢুকতেই পেয়ে গেল স্বপনদের।

ওরা এবার এগিয়ে গেল দোতলার দিকে ধীরে ধীরে । সবার আগে স্বপন। না কোন শব্দ নেই কোথাও। না দোতলায়ও কেউ নেই। এমন সময় নিচতলায় পিছনের দিকে কারো গলার আওয়াজ শোনা গেল মনে হয়।

প্রায় নিঃশব্দে সবাই নেমে এলো এক তলায়। দাঁড়াল তালা দেয়া দরজার সামনে। হঠাৎ ভিতর থেকে কেউ বলে উঠলো, পানি, পানি খাবো। স্বপনরা বুঝে ফেলল ঘরে কেউ নেই। হয় কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে, নয়তো পালিয়েছে।

স্বপন কোমর থেকে একটা চাকু বের করল। তালার পিছনে ঢুকিয়ে চাটনি দিল। একদিকের কয়রা খুলে চলে এলো।

দু'পাশে সরে গিয়ে হাত লম্বা করে আস্তে ঠেলা দিল, খুলে গেল দরজা। না, ভিতরে কেউ ওত পেতে নেই। তবুও অস্ত্র সামনে বাড়িয়ে ভিতরে ঢুকল স্বপন। দুপাশ থেকে টর্চ ফেলল অন্য দু'জন। ঘরের এক কোনায় একটি মেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। না, ঘরে আর কেউ নেই।
স্বপনদা বলল, দেখুন বোন আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আপনার আর ভয়ের কিছু নেই।
-আমাকে একটু পানি দেন প্লিজ। মেয়েটি বলে উঠলো।
সামনে এগিয়ে গেল স্বপন। দেখল, মেয়েটি আর কেউ নয়- শিরিন।
-শিরিন, আমি স্বপন। তোমার আর কোন ভয় নেই। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। শিরিন এই কথার কোন জবাব দিল না। তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে শুধু।

স্বপন শিরিনকে তুলে নিলো দু'ই হাতে। এবং আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বাহিরে। অন্যরা ওকে অনুসরণ করল । শিরিনকে নিয়ে ওরা চলে এলো বি এম স্কুলের পূর্ব পাশে। ওখানে দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। শিরিনকে মাঝে বসিয়ে ফাহিম ও মিল্টন রিক্সা ওয়ালাকে বলল, চলেন ভাই সদর হাসপাতালে।
অন্য রিক্সায় উঠল স্বপনরা তিনজন। সামনের রিক্সাটাকে অনুসরণ করছে ওরা। ফাহিমরা সদর হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ঢুকল। স্বপনদের রিক্সাটা ভিতরে ঢুকল না। চলে গেল অন্যদিকে। ডাক্তার ও নার্সরা শিরিনের কাছে এগিয়ে আসল।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক বিকেল।
ফাহিম টের পেল শহরের চতুর্দিকে খৈয়ের মত করে বোমা-পটকা ফুটছে। দূরে গোলাগুলির আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে এই শব্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং কাছে এগিয়ে আসছে।

ফাহিমরা সবাই ওদের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গত দু'একদিন ধরে কথা শোনা যাচ্ছিলো, মিলিটারিরা চলে যাবে ঢাকায়। ইন্ডিয়ান বাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ছুটে আসছে। ছোট বড় অনেক শহর নাকি এরই মধ্যে চলে গেছে মুক্তিবাহিনীর দখলে।
বরিশাল কি তবে স্বাধীন হতে শুরু করেছে ?
মজিদ সাহেব সামনের রাস্তায় নামলেন। ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা নিচে নেমে আয়। রাজাকারগুলো হয়তো এখনো ওত পেতে আছে চতুর্দিকে। দেখলে কিন্তু ওরা অঘটন ঘটাতে পারে। নিচে নেমে আয় সবাই।
ফাতেমা বেগম সামনের রুমে এলেন। দেশ স্বাধীন হচ্ছে ভেবে আনন্দে অস্থির। বুঝতে পরছিলেন না কীভাবে এটাকে উদযাপন করবেন। হঠাৎ তিনি ভাবলেন , ভাল কিছু রান্না করলে কেমন হয়? তিনি পাক ঘরের দিকে এগুলেন।

হঠাৎ মর্জিনা চিৎকার দিয়ে উঠল , ভাইয়া , দূরে 'জয় বাংলা' শ্লোগান হচ্ছে। কারা যেন শ্লোগান দিতে দিতে আমাদের রাস্তায় ঢুকল। ফিরোজ কান পাতল। শোনার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যাঁ হালকা একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। জয় বাংলা শ্লোগানের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বারান্দা থেকে নিচে

নেমে এলো ফিরোজ । পোশাক পাল্টে রাস্তায় নামল। বড় রাস্তায় যাওয়া দরকার। দেখবে আসলেই কী হচ্ছে।

বাদল ও মিল্টন এলো দৌড়াতে দৌড়াতে। বলল, ফাহিম! বরিশাল স্বাধীন হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনী শহরের চতুর্দিক থেকে ঢুকে পরেছে। চল চল ঘুরে আসি।

ওরা তিন বন্ধু বড় রাস্তায় চলে এলো। দেখল, পশ্চিম দিক থেকে ছোট ছোট দলে মুক্তিযোদ্ধারা শহরে ঢুকছে। তাদের মুখে শ্লোগান, জয় বাংলা, জয় বাংলা। প্রত্যেকের কাঁধে নানা ধরনের অস্ত্র। কেউ কেউ আনন্দে অস্ত্রের মুখ উঁচু করে গুলি ছুড়ছে আকাশে। মুখে তাঁদের বিজয়ের অনাবিল হাসি।

মিল্টন বলল, চল শহরের দিকে যাই। ওরা শহরের কেন্দ্র সদর রোডে চলে এলো। সব মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। কোলাকুলি করছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। শহর এক আনন্দ শহরে পরিণত হয়েছে। আনন্দে সব অস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রিয়জনের মাঝে বহুদিন পর ফিরে এসেছে। তাঁরা জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে।

ফাহিম, বাদল ও মিল্টন ওরা তিন বন্ধু সন্ধ্যার দিকে সদর হাসপাতালে গেল, ওদের শিরিন আপাকে দেখতে। গত দুইদিনে শিরিন অনেকটা সেরে উঠছে। কিন্তু সমস্যা হল কারো সাথে কথা বলতে চায় না সে। ওরা যেয়ে দেখল, স্বপনদা ওখানে। দাদা ডাক্তারের সাথে কথা বলছেন। উনার কাঁধে অস্ত্র।

শিরিনের বাবা গত দুইদিনে একবারও মেয়েকে দেখতে আসেননি। সম্ভবত শিরিনের উপর এটা প্রভাব ফেলেছে। কেন বাবা তাকে দেখতে আসেন না ? সে কি চায় না, মেয়ে বাসায় ফিরে যাক ? এটা কী করে হয় ? মায়ের কথা মনে হলে চোখ উপচে পানি আসে শিরিনের। মা বাসায় নেই , দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না । মা থাকলে নিশ্চয়ই অনেক আগেই ছুটে আসতেন। শিরিন এখন কী করবে ?

শিরিন কিছু আগে স্বপনকে সেই রাতের কথা সব বলল। বাসায় ঢুকে রাজাকাররা কীভাবে তাকে তুলে নিয়ে গেল। ফাহিমরা শিরিন আপার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, আপা জানেন, বরিশাল স্বাধীন হয়ে গেছে? মিলিটারিরা পালিয়েছে।

-তাই বুঝি ? উত্তাপ হীন গলায় বলল শিরিন।

-জানেন আপা, সারা শহরে এখন মিছিল আর মিছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কোলাকুলি করছে পরস্পরকে, সাধারণ মানুষকে।

-আচ্ছা আজগর ভাই কি এসেছে, দেখেছিস ?

- না আপা দেখিনি। ফেরার পথে আপনাদের বাসায় যাবো।

-আচ্ছা।

স্বপন এগিয়ে এলো। বলল, আমি এখন যাই, কাল আসবো। তাছাড়া আমার একটা কাজও আছে। স্বপন চলে গেল। শিরিনকে বলে বাদলরাও বের হল রাস্তায়। রাস্তার আনন্দ মিছিলে ওরাও ভিড়ে গেল।

১২

পরের দিনের কথা ।
স্বপনদের জিপ গাড়িটা উজিরপুর থানার এক গ্রামে এসে থামল। স্বপনের সাথে তিন মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এবং ফাহিম। অনেক অনুরোধ করায় ফাহিমকে সাথে নিতে রাজি হয়েছে স্বপন । ফাহিম বাদে প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র।
রুস্তম রাজাকারের বাড়ি এই গ্রামে। খুঁজে খুঁজে বাড়ি বের করে ফেলল স্বপনরা। কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। আশপাশের লোকজন জানালো চারদিন আগে এক বিকেলে কয়েকজন রাজাকার সহ রুস্তমকে শেষবার দেখা গেছে এই গ্রামে। রাতটা সম্ভবত গ্রামে কাটিয়েছে। পরের দিন থেকে আর দেখা যায়নি। নিশ্চয়ই কোথাও পালিয়েছে।
বড় রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ বললেন, রুস্তম রাজাকারকে উনি চেনেন। তিনদিন আগের এক সকালে তিনি রুস্তম সহ আরও দুজনকে একটা ভ্যানে করে যেতে দেখেছেন। অর্থাৎ স্বপনরা বুঝল, রুস্তম দলবল সহ পালিয়েছে। স্বপন রাগে কাঁপতে লাগল। এই রাজাকারকে তার খুঁজে পেতেই হবে। তার মত রাজাকারের বাংলার মাটিতে কোন ক্ষমা নেই। বিচারের কাঠগড়ায় এদের দাঁড়াতে হবেই হবে।

মিল্টন সকালে ফাহিমকে খুঁজতে এলো ওদের বাসায়। না, ফাহিম বাসায় নেই। মিল্টন ফিরে আসছিল। এর মধ্যে সাবিহা আপাদের বাসার ছোট মেয়েটাকে দেখল ওর দিকে দৌড়ে আসছে।
-কী ব্যাপার কৈতরী?
-আপা আপনারে বোলায়। হ্যায় কেমন যেন কাতরাচ্ছে।
-কেন ? কী হয়েছে ?
-আমি বুঝতাছি না।
মিল্টন তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে সাবিহা আপাদের বাসায় ঢুকল।
-মিল্টন ? ভাই, আমার শরীরটা ভাল না। রিক্সা নিয়ে আয় হাসপাতালে যেতে হবে। মিল্টন দুটো রিক্সা আনল। পথে বাদলকে নিয়ে নিলো। প্রায় দুপুরের দিকে ওরা সদর হাসপাতালে পৌঁছল। সাবিরাকে ভর্তি করা হর ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডে।
বিকাল পাঁচটার দিকে বাচ্চা হল সাবিহার। ছেলে বাচ্চা।
সাতটার দিকে মিল্টন ও বাদল গেল সাবিহা আপার বিছানার কাছে। সাবিহা শুয়ে আছে বিছানায়। পাশে ছোট্ট একটা বাবু শুয়ে আছে। মিল্টন দেখছে শিশুটিকে। মানুষ জন্মের সময় এত ছোট থাকে?
সাবিহা কাঁদছে। খোকন বুঝল না, কেন কাঁদছে। ওরা চুপচাপ দেখছে ছোট্ট বাবুটাকে।
-জানিস, ও দেখতে কেমন হয়েছে ? ঠিক ওর আব্বুর মত। ঠিক পারভেজের মত। পারভেজ তুমি কোথায় ? যুদ্ধ-তো শেষ । প্লিজ, এবার তুমি চলে এসো। এই বাবুটাকে কীভাবে আমি একা একা বড় করবো। প্লিজ, তুমি চলে এসো।

এদিকে পুরো দশদিন হাসপাতালে থাকার পর বাসায় ফিরল শিরিন। স্বপন ও ফাহিম গিয়েছিল তাকে আনতে। বাসায় ফেরার পর আস্তে আস্তে শিরিন টের পেল, তিন সপ্তাহ আগে যে শিরিন এই বাসায় থাকত, বর্তমান শিরিন সে নয়। শিরিন বাসায় আসার পর পরই প্রতিবেশীরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের বাসায়। সবাই আকারে ইঙ্গিতে জানতে চাচ্ছে, রাজাকাররা তার সাথে কী কী

আচরণ করেছে ? ক'জন রাজাকার ছিল বাসাটায় ? ইত্যাদি, ইত্যাদি। ছিঃ ছিঃ, এসব কি জানতে চাওয়া যায় ?

গ্রামের বাড়ি থেকে শিরিনের চাচা-চাচী এসেছেন। চাচী তো এক কাঠি বাড়া। তিনি প্রায়ই অশ্লীল বিষয়গুলো জানতে চান। ছিঃ ছিঃ । শিরিন একসময় আবিষ্কার করে, সবাই তার সাথে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে। চারটা প্রশ্ন করলে একটির উত্তর দেয়। শিরিনও ধীরে ধীরে অন্যদের এড়াতে শুরু করল। রুম থেকে তেমন একটা রেব হয় না। অন্যরাও তার রুমে কম আসে।

শিরিন বুঝে ফেলেছে, সবাই তাকে নিয়ে খুব অস্বস্তিতে আছে। সে ফিরে না এলেই বরং এদের অস্বস্তি থাকতো না। শিরিন চোখ কান বন্ধ করে প্রতীক্ষা করে তার ভাইয়ার। আসগর ভাই ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু কই ? আজগর ভাই তো আসে না। অথচ যুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় একমাস হল।

এক সকালে শিরিনের শরীর হঠাৎ খারাপ করল। ঘুম থেকে উঠেই বমি শুরু করল। পেটে কিছু নেই তারপরও বমির ভাব। শিরিন দেখল চাচি তাকিয়ে আছে তার দিকে। অর্থাৎ চাচীর মনে যে সন্দেহ, তার মনেও ওই একই সন্দেহ চলে এলো। ডাক্তাররা এমন একটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন এবং বলেছিলেনও। তখন অবশ্য কিছু করার সময় হয়নি। তাই করেন নি। বলেছিলেন, বমি বমি ভাব হলে যেন হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

শিরিন বুঝতে পারে কী ঘটতে যাচ্ছে এরপর। বিকেলের মধ্যে মহল্লার সবাই আবার তাদের বাসায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বলবে এখন কি করা উচিৎ। নানা উপদেশ দেবে। জানালার বাইরে তাকাল শিরিন। কী সুন্দর পৃথিবী। অথচ এই পৃথিবীটা এখন আর তার না।

জানুয়ারির মাঝামাঝি।

সকালে বাদল এসে ফাহিমকে খরব দিল, শিরিন আপাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফাহিম ও বাদল স্বপনদার বাসায় আসল। স্বপনের বাবা-মা ও ভাই বোন গতকাল ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন। উৎসবের আমেজ বাসায়। স্বপনকে ওরা পেল শিরিন আপাদের বাসায়।

শিরিন আপার বাবা এক কোনায় একটি চেয়ারে বসা। মাথা নিচু করে বসে আছে। চুপচাপ। কারও কথা শুনছে বলেও মনে হল না। আপার চাচা চাচি বলছেন, কীভাবে তারা আবিষ্কার করবেন শিরিন খুব সকালে বাসা থেকে কোথাও চলে গেছে।

স্বপন ফাহিম ও বাদলকে নিয়ে খুঁজতে বের হয়ে গেল। ওরা প্রথমে গেল নতুন বাজার বাসস্টান্ডে। তারপর গেল পটুয়াখালী-ঝালকাঠি বাসস্টান্ডে। না কোথাও নেই শিরিন। ওরা এবার গেল ঢাকার লঞ্চঘাটে। গেল স্টিমারঘাটে। অনেককে জিজ্ঞেস করল। শিরিনের মত কাউকে দেখেছে কিনা ?

কীর্তনখোলা নদীর ওপার কাউয়ার চর। ফেরিঘাটটি ঢাকার লঞ্চঘাটের কাছেই। ওরা এগুলো সেদিকে। দুপুর তখন। দূর থেকে একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। ওরা সেদিকে এগুলো। জটলার মাঝখানে ফাহিমরা শিরিনকে আবিষ্কার করর। একজন বয়সী মহিলা শিরিনের পাশে বসা। তিনি বলছিলেন কী হয়েছিল।

এক ঘণ্টা আগের কথা। মহিলা ও তার ছেলে শহরে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। কাজ শেষ করে ফিরছিলেন নৌকার ফেরিতে। মা ছেলে পাশাপাশি বসা। শিরিন বসেছিল মহিলার পাশে। ফেরি কীর্তনখোলা নদীর মাঝামাঝি যায়নি তখনো। হঠাৎ ফেরি থেকে লাফ দেয় শিরিন।

সবাই মনে করে পড়ে গেছে। দুই জন মাঝির একজন সাথে সাথে লাফ দিয়ে পড়ে। এরকম মাঝে মাঝে হয় ফেরি ঘাটে। মাঝিরা তখন এভাবে উদ্ধার করে যাত্রীকে। কিন্তু শিরিনকে তুলতে খুব কষ্ট হয়েছে মাঝিদের। কারণ শিরিন সাঁতার জানে না এবং অনেকদূর নিচে ডুবেও গিয়েছিল।

ঘাটে ফেরত আসার পর সবাই বুঝল মেয়েটি পড়ে যায়নি। ইচ্ছা করে ঝাপ দিয়েছে। কারণ সে কাঁদছিল এবং কেন তাকে উঠানো হল তার জন্য আক্ষেপ করছিল। সে বাঁচতে চায় না।

স্বপন শিরিনকে নিয়ে একটা রিক্সায় উঠলো। রিক্সা সোজা বাসার দিকে চলতে শুরু করল। ফাহিম ও বাদল অন্য একটি রিক্সায় সামনের রিক্সাকে অনুসরণ করছে। কিছুদূর যাবার পর শিরিন স্বপনকে তার বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা জানাল। বলল, সে প্রেগন্যান্ট। এই পৃথিবীর সবকিছু এখন তার কাছে মৃত ।

সাতদিন পর শিরিন আবার বাসা থেকে উদাও হয়ে গেল। ওই একই দিন থেকে স্বপনদাকেও আর দেখল না ফাহিমরা। দু'জন একত্রে কোথাও চলে গেল না তো ? দুই পরিবার থেকে খোঁজাখুঁজি চলল অনেক দিন। কিন্তু সময়ের নিয়মে একসময় সব থেমে গেল।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক